রজতশুভ্রর ডায়েরি...

সুমিত্রা ঘোষ

পুনশ্চ

সূচি

যে জন বুঝ মন	৯
তুমি না আমি	১৬
ভোলা কাহিনি	২৭
কতরূপে জননী	৩৫
ইসাবেল	৪২
মা'র কাণ্ড	৪৯
তবু স্বপ্ন দেখ	৫৯
ভাঙল মিলন মেলা	৬৩
দমকা হাওয়া	৭০
কেঁচো খুড়তে...	৭৬
কেউ বোঝে না	৮৬
রজতশুভ্রর ডায়েরির কটা পাতা	৯০

যে জন বুঝ মন

'ছোটো ঠাকুর! ও ছোটোঠাকুর! তাড়াতাড়ি ইদিকপানে একবারটি তাকাও গো! ও ছোটোঠাকুর!' মেজোতরফ বিষ্ণুপদর একমাত্র পুত্র গৌরাঙ্গপদ জমিদারির ব্যাপারে বড়োই উদাসীন। সচরাচর তাহাকে সেরেস্তায় দেখা যায় না। জ্যাঠামহাশয় কৃষ্ণপদ ভ্রাতুষ্পুত্রকে সেরেস্তার কাজকর্মে সাহায্য করিবার জন্য বিশেষ চাপ দিতে চাহেন না। কারণ গৌরাঙ্গকে প্রায় মাতৃ-পিতৃহীনই বলা যায়। ইহার দুই বৎসর বয়সে কৃষ্ণপদর মধ্যম ভ্রাতৃবধূ অর্থাৎ গৌরাঙ্গর মাতাঠাকুরানি গর্ভাবস্থায় দ্বিতীয় সন্তানের জন্মদানকালে অকালে প্রয়াণ করেন। সন্তানটিও বাঁচে নাই। পত্নীশোকে কাতর বিষ্ণুপদ বিবাগী হইয়া কাহাকেও কিছু না জানাইয়া একদিন গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। আর ফিরিয়া আসে নাই। গৌরাঙ্গপদ এই কারণেই জ্যাঠামহাশয় এবং ঠাকুরমাতা বরদাসুন্দরী দেবীর অতিস্নেহের পাত্র। জাত-ধর্ম-নির্বিশেষে এই গ্রামের প্রজাগণও তাহাকে বড়ো ভালোবাসে। দায়ে-অদায়ে, আপদে-বিপদে বামুনপাড়া হইতে দুলে বাগদিপাড়া এমনকী পতিতাপল্লিতেও সে নিজের বুক পাতিয়া সেবা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ইহারা তাহাকে মুখে মুখে শুধু ছোটোঠাকুর বলিয়া ডাকে না, অন্তর হইতে ইহাকে নরনারায়ণ রূপে ভক্তি করে। লেখাপড়া শিখিয়া বিদ্যার্জন করিয়াও দৌহিত্র সেরেস্তায় না বসিয়া কেবলমাত্র বাঁশি বাজাইয়া আর ঠেকায় পড়া গাঁয়ের মানুষের উপকার করিয়া যে ছন্নছাড়া জীবনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছে ইহা বরদাসুন্দরী দেবীর আর সহ্য হয় না। কাজেকর্মে মন না বসিলে সংসারেই বা কেমন করিয়া মন বসিবে? একমাত্র বাঁশিটি বাজাইবার সময় নাতি বুঁদ হইয়া থাকে অন্যথায় উহার মন যে কোথায় পলাইয়া যায় বরদাসুন্দরী থই পান না। তিনি অনুনয় করিয়া বুঝাইয়া-শুনাইয়া সেরেস্তায় বসাইতে পারিলে কিন্তু গৌরাঙ্গ সেইসব দিন নিবিষ্ট হইয়া কাজ করে। সরকারমশাই বলেন এমন কথা। আজ গৌরাঙ্গ সত্যই মন দিয়া হিসাবখাতা পরীক্ষা করিতেছিল, ঠিক তখনই উহার চ্যালাগুলি আসিয়া বাহির হইতে ডাকাডাকি করিতে আরম্ভ করিল। সরকারমশাই তাড়াতাড়ি বলিলেন — 'আর শুধু ঋণপত্রের খাতাখানা দেখা বাকি আছে ছোটোঠাকুর। ওইখানা একবার দেখে দিয়ে যেও না হয়।'

গৌরাঙ্গ উঠিয়া পড়িয়াছে যাইবার জন্য। বলিল —

'আগামীদিনে ওইখানা দেখে দেব না হয়। আজ আমি যাই সরকারমশাই।'

বাহিরে আসিয়া দেখে সহদেব, মাধু, দুলি, নবরা অপেক্ষা করিতেছে। — 'অমন করে চিক্কার করছিলি কেন, কী হয়েচে?'

সহদেব বলিল — 'কী হয়েচে? গাঁয়ে ওলাউটো এয়েচেন। মালোপাড়ার পদিবুড়ির কাল রেত থেকে বাহ্যে-বমি হচ্চিল। আজ সকালে বুড়ি মরেচে। উটোনে পড়ে আচে মড়া। মালোপাড়ার কেউ ওদিকে মাড়াচ্চে না। এখন তুমি কী করবে কর।'

এই কথা শুনিয়াই গৌরাঙ্গ বলিল — 'নব তুই এক্ষুনি সারা গায়ে ঢেঁরা পিটিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে চলে যা। সবাই জল ফুটিয়ে ঠান্ডা করে খাবে। কোনও লোক কোনও পুকুরে নেমে চান করবে না, জামাকাপড় কাচবে না। রুগির কাপড়-চোপড় সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে। যারা ঢেঁরা অমান্য করবে তাদের কঠিন শাস্তি পেতে হবে বলে দিস। যা তুই বেরিয়ে পড়। আর তোরা আমার সঙ্গে চল মালোপাড়ায়। পদিবুড়ির সৎকার তো আগে করি গে!'

যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ওলাউঠা গ্রামে মড়ক বাঁধাইতে পারিল না বটে, তবে পদিবুড়িকে উঠোনে নামাইয়া দিয়া পরিবারের অন্য যাহারা কপাট বন্ধ করিয়া নিজদিগকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছিল নিয়তির বিচারে উহাদের মধ্যে চারজন মরিল। মালোপাড়ায় অন্য একটি শিশুর ওলাউঠায় মৃত্যু ঘটিল। এই কয়দিন ধরিয়া বাঁশিখানা গৌরাঙ্গর কোমরে গামছার বাঁধনে গোঁজা হইয়াই থাকিল। সে তাহার নিত্য সঙ্গী পরহিতব্রত দল লইয়া নাওয়া-খাওয়া ভুলিয়া রোগ সংক্রমণ রোধ করা এবং শব দাহ করার কার্যে ব্যাপৃত হইয়া রহিল। শরীর মনের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য বাঁশি বাজাইবার অবকাশও পায় নাই।

জমিদার বাটিকার পূর্বদিকে নাটমন্দিরে স্থাপিত রাধা-গোবিন্দজির বিগ্রহ মন্দিরের পশ্চাতে পারিবারিক স্নানঘাটের ঝামা বাঁধানো সোপান একেবারে ভাগীরথীর প্রবহমান জলে গিয়া মিশিয়াছে। সোপানের মাথায় ছত্রধারণ করিয়া আছে প্রাচীন এক বটবৃক্ষ। ইহার নিচে পরিত্যক্ত শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এই স্থানটি গৌরাঙ্গর একান্তবাসের প্রিয়স্থান। পূর্বে পরিবারের রমণীগণ নিত্য গঙ্গাস্নান করিতেন। ইদানীংকালে বিশেষ তিথি ব্যতীত অন্যদিনে কেহ নাইতে আসেন না। পরিত্যক্ত ঘাটের নির্জনতায় বসিয়া অন্তরে অন্তরে নিঃস্ব যুবক বহুক্ষণ ধরিয়া বাঁশি বাজায়। সেই সময় সে এমন আত্মমগ্ন হইয়া পড়ে যে পারিপার্শ্বিক কোনও শব্দও তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারে না। তাহার বাঁশির সুললিত ধ্বনি বাতাস বাহিত হইয়া ভাগীরথীর স্রোতের সঙ্গে বহিয়া যায়। আবার কখনও সে বাঁশিও বাজায় না। একা একা সোপানে বসিয়া নদীর দিকে তাকাইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে থাকে। পাশে কেহ আসিয়া বসিলেও টের পায় না। সহদেব, নব, কানাইরা বলে ছোটোঠাকুরের 'ভর' হইয়াছে। কিন্তু দুলি জানে ভর-টর নহে। সে ছোটোঠাকুরের সান্নিধ্যে বেশি সময় কাটায়। ভাঙা শিবমন্দিরখানা ধুইয়া-মুছিয়া,

মাদুর পাতিয়া ঠাকুরের বসিবার উপযুক্ত করিয়া রাখে। তিনি মাঝে মাঝে জেলেদের ডিঙি লইয়া একাএকা গঙ্গায় ভাসিয়া পড়েন। সারাদিনের শেষে সন্ধ্যার আগে ফিরিয়া আসেন। কোথায় যান এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস দুলির নাই। সে শুধু উপোসি থাকিয়া ঘাটে বসিয়া ঠাকুরের ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষা করিতে পারে। ছোটোঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন— 'কী রে? তুই ভরসন্ধেবেলা ঘাটে বসে আচিস কেন?'

দুলি বলিতে পারে না — 'তুমি না ফিরলে আমি কোনপ্রাণে ঘরে যাই ঠাকুর?' সে বলে —'এমনিই বসে হাওয়া খাচ্চি ঠাকুর!'

উসকো-খুসকো, ক্লান্ত ছোটোঠাকুর রাধা-গোবিন্দর মন্দির পার হইয়া বাটিকার দিকে চলিতে চলিতে বলেন — 'অন্ধকার হয়ে আসচে দুলি এবার ঘরে যা।'

ওইসব ভর-টর নহে। দুলি ছোটোঠাকুরের মধ্যে এক পলাতক মানুষ দেখিতে পায়। তিনি অধিকাংশ সময় নিকটে থাকিয়াও সুদূরে থাকেন। গাঁয়ের লোকে বলে তাহার পিতৃদেবও নাকি এইপ্রকার উদাসী মানুষ ছিলেন। ছোটোঠাকুরও একদিন তাহার পিতার মতো বিবাগী হইয়া হারাইয়া যাইতে পারেন এই ভয়ে দুলি তিলে তিলে মরে। তাহার মনে হয় একমাত্র সে ছাড়া ছোটোঠাকুরকে আর কেহই ভালো করিয়া বুঝে না। কন্যাসন্তান হইয়াও বাল্যকাল হইতে সে ইহাদের সঙ্গে গায়ে ধুলা-মাটি মাখিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া খেলা করিয়া বড়ো হইয়াছে। সেই বয়সে সে যে পতিতার মেয়ে এই কথা সেও বুঝিত না, উহারাও বুঝিত না। বড়ো হওয়ার পর উহারা নিশ্চয় জানিয়াছে। কিন্তু কখনও মুখ ফুটিয়া বলেও নাই কিংবা ছলছুতা করিয়া তাহাকে ত্যাগও করে নাই। গাঁয়ের গৃহস্থ মানুষ দুলির সঙ্গে ইহাদের মেশামিশি লইয়া নিন্দা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া এখন কিছু বলাই ছাড়িয়া দিয়াছে। এইভাবে দিনের অধিকাংশ সময় ইহাদের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইয়া, নানা ফাইফরমাশ খাটিয়া সহায়তা করিয়া কখন যে সে বড়ো হইয়া এক সুন্দরী তরুণী হইয়া উঠিয়াছে, কখন যে অলক্ষ্যে-অজান্তে ছোটোঠাকুর তাহার হৃদয়ে প্রাণের ঠাকুর হইয়া আসন পাতিয়া ফেলিয়াছেন ইহা বুঝিতে পারে নাই। যখন বুঝিল তখন ইহাও বুঝিল এই অসম্ভব এ জীবনে কোনওদিন সম্ভব হইবার নহে। সে নিজে সাধনার দ্বারা যদি তাহার হৃদয়ে প্রস্ফুটিত ফুলটিকে নির্মল করিয়াও রাখে তবুও ইহা কোনওদিনই দেবতার পূজার থালিতে স্থান পাইবে না। বেবুশ্যের মেয়ে গঙ্গার মতো পবিত্র হইলেও গৃহস্থঘরে বধূরূপে স্বীকৃত হয় না। ছোটোঠাকুর তাহার মনের খবর রাখেন না এই রক্ষা। রাখিলে কবেই হয়তো ঘৃণায় তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতেন।

গৌরাঙ্গ ভাঙা দেউলে মাদুরে পা ছড়াইয়া বসিয়া বাঁশিতে বুঁদ হইয়াছিল। এমন সময় কানাই আসিয়া ডাকিল — 'ছোটোঠাকুর! শালুক পুকুরপাড়ে বুড়ো বটের বেদিতে একজন সাধু এয়েচেন। আমরা দুলির জন্য পানিফল তুলতে যাচ্ছিলুম। সাধু শুয়ে

আচে দেখে কাছে গিয়ে দেখি ওঁর শরীর খুব খারাপ। ফস্‌সা বন্ন জ্বরের তাপিশে লাল হয়ে আচে। কথাও বলতে পারচে না। সদেব আর দুলি ওখানে আচে। তুমি চল।'

বাঁশি কোমরে গুঁজিয়া গৌরাঙ্গ বলিল — 'হুম। মাথায় জল ঢালতে হবে। তুই কোবরেজমশাইকে খবর দিয়ে ওখানে চলে যা। আমি বাড়ি থেকে মাটির হাঁড়ি আর একঘটি খাবার জল নিয়ে আসচি।'

গৌরাঙ্গ আসিয়া দেখিল সাধু অচৈতন্য। দুলি শালুক পুকুরে আঁচল ভিজাইয়া তাঁহার কপালে জলপট্টি দিতেছে আর সহদেব নিজের ফতুয়াখানা দিয়া বাতাস করিতেছে। কানাইও কবিরাজমশাইকে লইয়া আসিয়া পড়িল। রুগির শরীরের তাপ, চোখ দেখিয়া, নাড়ি চিপিয়া কবিরাজমশাই মাথা নাড়াইয়া বলিলেন — 'এনার মায়ের দয়া হয়েচে। গুটি বসন্ত। ওষুধ কিছু নাই। নিমপাতা, চন্দন বাটার প্রলেপ দিতে পারো। খুব সাবধান। বেশি ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না বাবারা। সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে।' এই কথা শুনিয়া অন্যরা সকলেই ভিত হইল। সহদেব বলিল — 'কোবরেজমশাই ঠিক কথাই কয়েচেন ছোটোঠাকুর। মায়ের দয়া যে ভয়ানক ছোঁওয়াচে! চেনা নেই, জানা নেই...।—

'চুপ!' — কড়া গলায় ধমক দিল গৌরাঙ্গ — 'চেনা-জানা নয় বলে মানুষটাকে একা একা মরতে দিয়ে পালিয়ে যাব এমন কাপুরুষ নই আমি। তোরা চলে যা। আমি এখানেই থাকব।'

—'আমিও যাব না।' — দুলি ঘোষণা করিল — 'সদেবদাদা, তোমরা যাবার আগে চাট্টি নিমপাতা পেড়ে দিয়ে যাও। আর মাকে খপর দিয়ে দিও আমি এখন ফিরব না।'

সাধুর অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইতে লাগিল। দুলি ঘরে গিয়া নিমপাতা আর চন্দন বাটিয়া আনিয়াছে। লেপন করিবার জন্য শরীর হইতে গেরুয়া বস্ত্রখানা খুলিতেই গৌরাঙ্গ দেখিল সাধুর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা এবং যজ্ঞোপবীত। ডানহাতের বাহুতে রুপার শিকল দিয়া বাঁধা ডিম্বাকৃতি একখানা রুপার হাতপাটা। রুদ্রাক্ষের মালা এবং হাতপাটাখানা খুলিয়া সাধুর থলিতে ভরিয়া রাখিল। দুলি তখন যত্নসহকারে প্রতেকটি গুটির ওপর নিমপাতা বাটা লেপন করিল। মুখে-কপালে চন্দনের প্রলেপ দিল। দুই দিন দুই রাত্রি ধরিয়া আহার-নিদ্রা ভুলিয়া ইহাদের যুগ্ম সেবাযত্নকে অগ্রাহ্য করিয়া অজ্ঞাতপরিচয় সাধু লৌকিক লোক হইতে নীরবে প্রয়াণ করিলেন। গৌরাঙ্গ জীবনে বহুবার জাত বিচার না করিয়া অজাত-কুজাতের পড়িয়া থাকা শব দাহ-সৎকার করিয়াছে। আজ ব্রাহ্মণ হিসাবে শ্মশানে ব্রাহ্মণ সাধুর শব মুখাগ্নি করিয়া দাহ সৎকার করিবার পর গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন করিয়া ডুব দিয়া স্নান করিয়া আসিল।

গেল মাসে দুলির বয়স ষোলো বছর পূর্ণ হইয়াছে। উহার মা বাতাসি এইবার মেয়ের কান্নাকাটিতে কান না দিয়া তাহাকে নিজবৃত্তিতে নামাইবার উদ্যোগ লইয়াছে। দুলি আত্মহত্যার ভয় দেখাইয়াও মাকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া পাগলিনি প্রায় হইয়া

রহিয়াছে। তাহার অপরূপ সৌন্দর্য অযত্নে মলিন, মেঘের মতো কেশদাম রুক্ষ, সে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইলেও প্রাণহীন।

ছোটোঠাকুরের চোখে তাহার মনোবেদনা ধরা পড়ে না। সে মনস্থির করিয়া লইয়াছে তাহার এই পবিত্র তনুখানা সে কিছুতেই নোংরা হইতে দিবে না। গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া নিজেকে বাঁচাইবার আর পথ খোলা নাই।

কলিকাতা বন্দরে টম্পসন সাহেবের গুদাম হইতে মালপত্র লইয়া বশির আলির গয়নার নৌকাখানা ঘাটে আসিয়া ভিড়িলেই ছোটো-বড়ো সকলের আর আনন্দ ধরে না। মহাজনরা দুই-তিন দিন ধরিয়া মাল নামায় আর গ্রামের লোক মাল্লাদের মুখে কলিকাতার গল্প শোনে। সমাজপতিদের সমালোচনার আসরখানা চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বৈকালে ঘাটে চলিয়া আসে। গয়নার নৌকার মালিক বশির আলি বহু বছর ধরিয়া টম্পসন সাহেবের নিকট বিশ্বস্ত মালপরিবহণকারী বলিয়া যথেষ্ট আদৃত। ভাগীরথীর দুই কূলের গ্রাম-গঞ্জের ঘাটে-ঘাটে তাহার ঘর, বাটে-বাটে আপনজন। বশির আলির চোখ তাহার প্রিয়পাত্র সন্তানসম ছোটোঠাকুরকে খুঁজিয়া বেড়ায়। তাহার জন্য মস্তবড়ো সুখবর লইয়া আসিয়াছে সে। এইবার ছোটোঠাকুর সামাজিক বন্ধন মুক্ত হইয়া কলিকাতায় বসত করিতে পারিবেন। ঠাকুরের অনুরোধে টম্পসন সাহেবের নিকট শিক্ষিত গৌরাঙ্গপদ মুখোপাধ্যায়ের চাকুরির আবেদনপত্রটি আগেরবারে লইয়া গিয়া জমা দিয়াছিল। এইবার আসিবার সময় কলিকাতা বন্দরে একটি উচ্চপদে গৌরাঙ্গপদর নিয়োগপত্রটি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে সে।

বরদাসুন্দরী ছাদের ওপর গৌরাঙ্গর ঘরখানা গুছাইতেছেন। নাতি ছাদেই বসিয়া বঁড়শিতে কলিকাতা হইতে বশির আলির আনিয়া দেওয়া রঙিন বিদেশি ফাতনাগুলি বাঁধিতে ব্যস্ত। এমনসময় বরদাসুন্দরী হাতে একখানা গেরুয়া থলি লইয়া রাগতভাবে বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন — 'ভেবেছটা কী দাদা? বাপের মতো তুমিও সন্ন্যাসী হবে? আমাকে কাঁদিয়ে পালিয়ে যাবে? এগুলি কি জন্য এনেছ বল।' — থলিতে হাত ঢুকাইয়া খড়ম, রুদ্রাক্ষের মালা, পুথি সব বাহির করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ কাণ্ড দেখিয়া হাসিয়া বলিল —'আমি কোন্ দুঃখে সন্ন্যাসী হতে যাব গো ঠাকুরমা? এগুলো তো ওই যে ব্রাহ্মন সাধু মারা গেলেন সেদিন, তাঁর জিনিস।'

ততক্ষণে ঠাকুরমা রুপার হাতপাটাখানা চোখের সামনে ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতেছেন। হঠাৎ আকুল স্বরে বলিয়া উঠিলেন — 'এটা কোথায় পেলে দাদা?'

—'এটা ওই সাধুর ডানহাতে বাঁধা ছিল।'

ঠাকুরমা চিৎকার করিয়া কাঁদিতে এবং বিলাপ করিতে শুরু করিয়াছেন — 'ওরে বিষ্টু রে! তুই ঘরের দরজায় এসেও ঘরে আসতে পারলি না বাপ! আমাকে আবার ফাঁকি দিয়ে ছেলের হাতে আগুন নিয়ে চলে গেলি? হলধর স্যাকরাকে দিয়ে এই